সিরাজুর রহমান-এর কলম

আওয়ামী লীগ নিজের মৃত্যুঘন্টাই বাজালো সেদিন

ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন ত্রিশের দশক থেকেই জোরদার হয়। সে আন্দোলন আইন-শৃঙ্খলার প্রতি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের অসহযোগ এবং 'কুইট ইণ্ডিয়া' অভিযানে। যুদ্ধের সময় জাপানীদের হাতে ধরা পড়া ভারতীয় সেনা অফিসারদের নিয়ে নেতাজী সুভাস বোস সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর এসব অফিসার বৃটিশদের হাতে ফিরে আসে। বৃটিশরা সামরিক আইনে এঁদের বিচারের উদ্যোগ করেছিলো। সে বিচারে তাঁদের প্রাণদণ্ডের শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো।

ক্যাপ্টেন রশিদ আলী, ক্যাপ্টেন শাহ নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন প্রমুখ সাবেক আজাদ হিন্দ বাহিনীর অফিসারদের বিচার বন্ধের জন্যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন হয়। আন্দোলন সবচাইতে বেগবান ছিলো কলকাতায়। আরো বহু ছোটখাটো বিষয়ও প্রায়ই স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো। এসব আন্দোলন দমনে বৃটিশ শাসকদের প্রধান অস্ত্র ছিলো ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা। কোথাও সভাসমাবেশ কিম্বা মিছিল হবে খবর পেলেই বৃটিশ শাসকরা সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করতেন। সে আদেশ অমান্য করা হলে বৃটিশের পুলিশ লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলি চালিয়ে অমানুষিক নির্য্যাতন করেছে, জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। বহু মানুষ মারাও গেছে পুলিশী নির্য্যাতনে। সাধারণ মানুষ এই ১৪৪ ধারাকে বলতো ইংরেজের মরণ কামড়। অবশেষে সেটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। শত নির্য্যাতন চালিয়েও তারা ভারত সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতেই হয়েছে।

সাম্রাজ্য ধরে রাখার জন্যে বৃটিশরা যে আইন পাশ করেছিলো স্বাধীন পাকিস্তান (এবং ভারতও) সে আইনটি বাতিল করেনি। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসন অল্প দিনের মধ্যেই খুবই অপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনসাধারণের রাজনৈতিক সমালোচনার কণ্ঠরোধ করতে প্রায়ই এ আইনের অপপ্রয়োগ হয়েছে। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর ১৪৪ ধারা।

ভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ সেদিন বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে প্রাদেশিক আইন সভার সামনে দিয়ে মিছিল করে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তখন ব্যাপক বলাকওয়া হচ্ছিলো যে শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার নির্বাচন হবে। আওয়ামী লীগ ধরেই নিয়েছিলো যে নির্বাচন হলে তারাই বিজয়ী হবে। ২১ ফেব্রুয়ারী কোন অশান্তি সৃষ্টি করে তারা নির্বাচন পিছিয়ে দেবার ঝুঁকি নিতে চায়নি।

আওয়ামী লীগকে আন্দোলনে রাখার উদ্দেশ্যে ছাত্ররা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে তাদের মিছিল শান্তিপূর্ণ হবে। সে ভিত্তিতে আগের দিন (২০ ফেব্রুয়ারী) পত্রিকা সম্পাদক পরিষদের অনুরোধে চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমেদ ১৪৪ ধারা জারী না করতে সম্মত হন। কিন্তু শেষ বিকেলে হঠাৎ করে ১৪৪ ধারা জারীর ঘোষণা দেওয়া হয় – অনেক পরে জানা গিয়েছিলো যে করাচীর নাজিমুদ্দিন সরকারের নির্দেশে 'ছাত্রদের উচিৎ শিক্ষা দেবার' জন্যে। একুশে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করেছিলো। চারজন ছাত্র সেদিন পুলিশী বর্বরতায় শহীদ হন। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সে ১৪৪ ধারাও মুসলিম লীগের 'মরণ কামড়' ছিলো। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলিম লীগের শেষ সমর্থনও নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিরাট জয়লাভ করে। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র খালেক নেওয়াজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। এবং সকলেই এখন স্বীকার করেন ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়ই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো।

শান্তিরক্ষার জন্যে নয়, অশান্তি ঘটানোর চেষ্টায়

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৪৪ ধারা জারি হচ্ছে বলতে গেলে সকাল-বিকেল। ব্যাপারটা এখন প্রায় ছেলে-খেলায় দাঁড়িয়ে গেছে এবং কোন সন্দেহ নেই যে ১৪৪ ধারা আওয়ামী লীগেরও মরণ কামড় প্রমাণিত হবে।

শেখ হাসিনার সরকার ১৪৪ ধারা জারি করছে শান্তি রক্ষার জন্যে নয়, অশান্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। বাংলাদেশের কোথাও সরকার-বিরোধী কোন দল কোন সভা-সমাবেশ ডাকলে কিম্বা মিছিলের ঘোষণা দিলে আওয়ামী লীগ কিম্বা তার কোন শাখা-প্রশাখা একই সময় একই স্থানে অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। অবশ্যই ওপর থেকে সরকারী নির্দেশে স্থানীয় কর্মকর্তারা 'শান্তির রক্ষার' অথবা 'অশান্তি প্রতিরোধ করার' অজুহাত দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করেন। সরকারের নীতি ও কর্মের সমালোচনা করার (যেটা তাদের সংবিধান-স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার) লক্ষ্যে বিরোধী দলটির সভা কিম্বা সমাবেশ করার উদ্যোগ তাতে পণ্ড হয়ে যায়। বিরোধী দল যদি ১৪৪ ধারা অমান্য করে তাহলে শাসক দল হাতে চাঁদ পাবে। তাদের ক্যাডার ও গুণ্ডাবাহিনী বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, খুন-খারাপী করবে।

শেখ হাসিনার এটা পুরাতন কৌশল। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা পেয়ে তিনি একটি সশস্ত্র ক্যাডার গঠন করেছিলেন এবং বিরোধী দলকে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে তাদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। বিএনপি কোথাও সভা-সমাবেশ করার অনুমতি চাইলে অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হয়। অনুমতি দেওয়া হলে শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গসংস্থাগুলো হঠাৎ করে একই স্থানে কোন কর্মসূচি ঘোষণা করে।

শান্তিরক্ষার পরিবর্তে সম্পূর্ণ দলীয়কৃত পুলিশ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালাবে।

শেখ হাসিনার এটা পুরাতন কৌশল। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা পেয়ে তিনি একটি সশস্ত্র ক্যাডার গঠন করেছিলেন এবং বিরোধী দলকে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে তাদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। বিএনপি কোথাও সভা-সমাবেশ করার অনুমতি চাইলে অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হয়। অনুমতি দেওয়া হলে শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গসংস্থাগুলো হঠাৎ করে একই স্থানে কোন কর্মসূচি ঘোষণা করে।

আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী চরিত্র

শেখ হাসিনার প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে এমন ঘটনা অজস্রবার ঘটেছে। রক্তপাত এবং প্রাণহানিও ঘটেছে অনেক। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ড. এইচ বি ইকবালের নেতৃত্বে আওয়ামী ক্যাডাররা বিএনপির মিছিলে গুলি চালিয়ে চার জনকে হত্যা করে। সে ঘটনার অজস্র ছবি পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। ছবিগুলো এতোই পরিষ্কার ছিলো যে ড. ইকবাল এবং বন্দুকধারী ঘাতকদের পরিষ্কার সনাক্ত করা গেছে। এবারে ক্ষমতা পেয়ে হাসিনার সরকার ড. ইকবাল ও ঘাতকদের বিরুদ্ধে হত্যার মামলাটি তুলে নেয়।

এই কুমতি-দুর্মতি আওয়ামী লীগের কেন হলো? জবাব খুবই পরিষ্কার। আওয়ামী লীগ কখনোই গণতান্ত্রিক দল ছিলোনা। রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিরোধী দলকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করা না গেলে তারা রাজনীতি করতে পারেনা। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হবার সময় নতুন বাংলাদেশ সংসদে দু'তিনজন ছাড়া অন্য সকল সাংসদ ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। তাছাড়া মুজিবের মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী। তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নিজেকে নিরাপদ বোধ করেনি, রক্ষী বাহিনী দিয়ে তারা ৪০,০০০ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে হত্যা করেছিলো। একদলীয় সংসদ গঠনের জন্যে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে একটা মধ্যমেয়াদী নির্বাচন দিয়েছিলো। ফাঁকা মাঠে গোল দেবার এ প্রবণতা শেখ হাসিনার মধ্যে ষোলোআনা।

স্বৈরতন্ত্র আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় প্রবণতা। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সর্বময় পরিস্থিতি (সর্বব্যাপী দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সঙ্কট, কালা কানুন নামে খ্যাত জরুরী ক্ষমতা আইনে হাজার হাজার মানুষ গ্রেফতার, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) এতোই শোচনীয় ছিলো যে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ অবশ্যই পরাজিত হতো। সে সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যেই মুজিব গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে স্বৈরতন্ত্রী বাকশাল প্রবর্তন করেন এবং নিজেকে আজীবন নির্বাহী রাষ্ট্রপতি করার ব্যবস্থা নেন।

মুখে গণতন্ত্র আর নির্বাচনের কথা বললেও শেখ হাসিনা মনেপ্রাণে স্বৈরতন্ত্রী। লে. জে. এরশাদকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে সেজন্যেই তিনি সামরিক স্বৈরতন্ত্রকে নয় বছর টিকিয়ে রেখেছিলেন। বর্তমান মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হবার দিনটি থেকে তিনি বাকশালী কায়দায় স্বৈরতন্ত্রী শাসন কায়েম করে স্থায়ী ভাবে গদি দখল করে থাকার পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর দলের শীর্ষ নেতাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলেছেন যে তাঁরা বাকশালী পদ্ধতির একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালু করার জন্যে জামাতে ইসলামের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছিলেন শেখ হাসিনা। সে আন্দোলনে রক্ত ঝরেছে, মানুষ মারা গেছে, অর্থনীতির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। চিরস্থায়ী ভাবে গদি দখল করে থাকার মৎলবেই বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বাতিল করেছে এবং সম্পূর্ণ দলীয়কৃত প্রশাসনকে ব্যবহার করে সাজানো নির্বাচনে জয়ী হবার ষড়যন্ত্র আঁটছে।

বিরোধী দলের কণ্ঠরোধের চেষ্টা কেন?

এদিকে এ সরকারের ব্যর্থতা পর্বত-প্রমাণ। একটাও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তারা পালন করতে পারেনি। বর্তমান সরকারের দুর্নীতি মুজিব সরকারের আমলের সঙ্গেই তুলনীয়। বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র সহ সাহায্যদাতা সংস্থা ও দেশগুলো এ সরকারকে দুর্নীতিবাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। এসব সত্ত্বেও তারা ভারতের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও হস্তক্ষেপের দ্বারা গদিতে বহাল থাকতে চায়। সেজন্যেই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সহ দেশের মূল সম্পদগুলো ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নদী, বন্দর সবকিছুই তারা বিনা মূল্যে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দরাবাদ ও সিকিমের মতো বাংলাদেশকেও পুরোপুরি গ্রাস করে নেওয়া ভারতের অনেক দিনের পরিকল্পনা। হাসিনাকে গদিতে রেখে সে পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত করতে চায় ভারত।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ পত্রিকা পড়েনা, রেডিয়ো শোনেনা, টেলিভিশন দেখেনা। নেতা-নেত্রীদের মুখের কথা থেকে তারা দেশের পরিস্থিতি জানতে চায়, যাতে তারা পরবর্তী নির্বাচনে কাকে ভোট দেবে স্থির করতে পারে। সেটা আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার জন্যে অন্তরায় হবে। তারা চায়না যে তাদের ব্যর্থতা, তাদের দুর্নীতি, সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা সাধারণ মানুষ জানুক, বুঝুক। সেজন্যেই তারা বিরোধী দল ও গোষ্ঠিগুলোকে সভা-সমাবেশ করতে দিতে চায়না, ফ্যাসিস্টদের মতো তারা অস্ত্রবলে হলেও সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

তাদের ষড়যন্ত্র যে দেশবাসী বুঝে ফেলেছে আওয়ামী লীগ এখন সেটা টের পেয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের কাতারে সেজন্যেই এখন এমন আতঙ্ক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এখন উল্টোপাল্টা কাজ ও আজেবাজে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। কেবলই তিনি বলে যাচ্ছেন যে দেশের স্থায়িত্ব নষ্ট করতে এবং অশান্তি সৃষ্টি করতেই খালেদা জিয়া আন্দোলন করছেন। সুস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারলে হাসিনা নিজেই বুঝতে পারতেন যে তাঁর এসব কথা হাস্যকর, তাঁর অভিযোগে কোন সত্যতা নেই। রোডমার্চ করে বিরোধী দলীয় নেত্রী সিলেটে, রাজশাহীতে, খুলনায় ও চাটগাঁয় গেছেন। বহু পথসভায় এবং বিশাল বিশাল কয়েকটি জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়েছেন। কয়েক কোটি মানুষ তাঁর সেসব ভাষণ শুনেছে। কিন্তু কোথাও শান্তিভঙ্গ হয়নি।

আতঙ্কিত আওয়ামী লীগ, প্যাথেটিক অপচেষ্টা

তারপরেও গতো রোববার ২৯ জানুয়ারী রাজধানীতে খালেদা জিয়ার মিছিল ও সমাবেশ যেভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আতঙ্ক এবং তাদের ফ্যাসিবাদী আচরণই তাতে বিশ্ববাসী দেখতে পেয়েছে। এ কর্মসূচি খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন ২০ দিন আগে, ৯ জানুয়ারী চট্টগ্রামের বিশাল জনসমুদ্রে। বরাবরের স্বভাব মতো আওয়ামী লীগ মাত্র ২৬ জানুয়ারী ২৯ তারিখে নিজেদেরও কর্মসূচি ঘোষণা করে। এবং এ সরকারের ফর্মুলা অনুযায়ী শান্তি ভঙ্গের দোহাই দিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ উভয় দলের সভা-সমাবেশই নিষিদ্ধ করে দেয়। বিএনপি সেদিন প্রশংসনীয় বিজ্ঞতা ও সংযমের পরিচয় দিয়েছে। তারা রাজধানীর সমাবেশ ও মিছিল পরদিন (৩০ জানুয়ারী) পর্য্যন্ত পিছিয়ে দেয়। কিন্তু, কি বিচিত্র! ২৯ তারিখ রাতে আওয়ামী লীগ ঘোষণা দেয় যে তারাও ৩০ তারিখে সভা-সমাবেশ করবে।

নগর পুলিশ প্রধানের কি বিপর্য্যস্ত অবস্থা সেদিন সন্ধ্যায়। তিনি বড়জোর বলতে পেরেছিলেন যে পরদিন বিএনপির কর্মসূচির অনুমতি তিনি দেননি, তবে সে কর্মসূচিতে বাধাও দেবেননা। বিএনপি যথারীতি তাদের কর্মসূচি পালন করেছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে। আওয়ামী লীগের শত উস্কানি সত্ত্বেও বিরোধী দল আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেনি। ঢাকায় অবস্থিত শতাধিক দূতাবাসের কূটনীতিকরা, সাংবাদিক-ব্যবসায়ী ও এনজিও কর্মীরা আরো একবার প্রমাণ পেলেন যে বিরোধী দল, বিশেষ করে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই অসত্য, নিছক গাত্রজ্বালা সঞ্জাত। সে সঙ্গে তাঁরা আরো দেখেছেন ২৯ জানুয়ারী চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুরে (এবং ৩০ জানুয়ারী রাজশাহীতে) পুলিশী বর্বরতা। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের শেষ দিনগুলোর মতো সে দু'দিনে তারা পাঁচটি অমূল্য প্রাণ হত্যা করেছে। ২৯-৩০ জানুয়ারী প্রকৃতই আওয়ামী লীগ ও তাদের সরকারের জন্যে কলঙ্কের দিন। তারা যে কতোখানি ভীত, আতঙ্কিত, এই হচ্ছে তার প্রমাণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন যে কতো শঙ্কিত তার আরেকটি প্রমাণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের করুণ, প্যাথেটিক প্রচেষ্টা। বিশ্বব্যাপী বহু ব্যর্থ ও সফল সামরিক অভ্যুত্থানের খবর আমি দেখেছি, প্রচার করেছি। কিন্তু কোন সেনাবাহিনী সংবাদ সম্মেলন করে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের খবর প্রচার করে বলে এই প্রথম শুনলাম। আইএসপিআর প্রধানের বিবৃতিতে ধর্মানুরাগী মুসলমানদের খারাপ আলোতে দেখানোর এবং বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' সরকারের পক্ষে মিডিয়ার সমর্থন ক্যানভাস করার চেষ্টা লক্ষ্যমান। কিন্তু আলোচ্য ঘটনা কি 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা' অথবা 'সামরিক ক্যু'র চেষ্টা ছিলো বোধগম্য নয়। সেনাবাহিনীর একজন সাবেক পদস্থ কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ইকোনমিস্টকে বলেছেন, তিনি মোটেই ধর্মান্ধ নন; তাঁর বাড়ীতে হানা দিয়ে কর্তৃপক্ষ অস্ত্রশস্ত্র পায়নি, পেয়েছে নানা ব্র্যাণ্ডের হুইস্কি ও ব্র্যাণ্ডি।

(লন্ডন, ০১.০২.১২)

serajurrahman@btinternet.com